গল্প লেখার গল্প

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

গল্প-উপন্যাস লেখা কঠিন, না লেখা আরো কঠিন। হঠাৎ কোনো এক অদ্ভুত দৃশ্য, আশর্চ্য ঘটনা, খুচরো কথা, বেহিসেবী স্থান - নাম মনের দরজায় কড়া নাড়ে। তখন কলম - কাগজ না নিয়ে বসলে নিস্তার নেই। যা লিখি তার দাম হয়তো কান াকড়ি। কিন্তু লেখার তাগিদটা এড়াতে পারিনা। বিষয় আসে নানা ভাবে অনেক সময় অতর্কিতে। কিন্তু যা নিয়ে আমার প্রধান মাথাব্যথা তা হল ভাষা, মাধ্যম শৈলী - এক কথায় নির্মাণ। এই নির্মিতির মাধ্যমেই বিষয়ের বীজ থেকে তার পাতা - ফুল, শাখা - প্রশাখায় পৌঁছতে চেষ্টা করি। গত বিশ বছর ধরে 'কী' এবং 'কেমন করে' --- এই দুয়ের ভেতর গাঁটছড়া বঁ াধতে চেষ্টা করি। গত বিশ বছর ধরে 'কী' এবং 'কেমন করে' --এ দুয়ের ভেতর গাঁটছড়া বাঁধতে চেষ্টা করছি। পারি নি। তবে ব্যর্থতার ভেতর এক ধরণের অভিজ্ঞতা তো অর্জন করে নেওয়া যায়। নিজের স্বপ্নের গল্প কিংবা উপন্যাসটি না লিখতে পারলেও চোখ - কানের দরজা খানিক খোলা। তখন একজন ব্যক্তিকে ফুট - ইঞ্চির বাইরের মাপে চোখে পড়ে, একজন মানুষকে তার উচচারণের বাইরেও শোনা যায়, একজন চেনা পড়শিকে তার অচেনা স্তরে জানা যায়।

আমি গাঁয়ের ছেলে আর সে কারণে রামায়ণগান, কীর্তন, কথকতা, তুষুগান শুনতে শুনতে আমার বেড়ে ওঠা। কতবার কীর্তনের ধুলুটির পর 'গোরাচাঁদ' হয়ে 'নগর ভ্রমণে' গেছি। ছোটবেলায় মায়ের হাজার ঘর - সংসারের কাজ, গল্প শোন ানোর ফুরসৎ ছিল না। আমি জানতাম না দ্রৌপদীর শাড়ির মতো দীর্ঘ - সংসারের কাজ গল্প শোনানোর ফুরসৎ ছিল না। আমি জানতাম না দ্রৌপদীর শাড়ীর মতো দীর্ঘ দুপুর গুলো কি করে কাটাবো। এই অলস দুপুর গুলো থেকে আমাকে উদ্ধ ার করেছিল দিবাকরের পিসি। তাকে দেখতে ছিল ঠিক চাঁদবুড়ির মতো। একমাথা সাদা চুল - আর খয়ের কাঠের মতো শুকনো কালো শরীর। যাঁরা 'নন্দন' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় আমার 'মিছিল' গল্পটি পড়েছেন তাঁরা দিবাকরের পিসির একটি ছবি পাবেন। পিসি বলেছিল তার মাথার সাদা চুলগুলো তুলে দিলে সে আমাকে গল্প শোনাবে। ততদিনে ধারাপ াতে আমার হাতেখড়ি হয়েছে। হিসেব করে দেখেছিলাম মাথায় যা চুল আছে তাতে একশ, হাজার, লক্ষ বছর লাগবে সবগুলো চুল তুলতে আর এই এক লক্ষ বছর ধরে পিসি প্রতিটি দুপুর দুর্গামণ্ডপে বসে আমায় নিত্যদিন একটি করে গল্প শোনাবে। যাঁরা আমার গল্প - উপন্যাস পড়েছেন তাঁরা জানেন যে আমার গল্প - কথনের ভঙ্গিটি কথকতার। এই রীতিটি আমি দিবাকরের পিসির কাছ থেকে পেয়েছি। পিসির মতো শব্দের এমন পাকা কারিগর আমি আজ অব্দি দেখিনি।

সাতের দশকে খান - দশেক গল্প লেখার পর মনে হল লেখাপত্র বন্ধ রাখা ভাল। ঐ সময়ে যা কিছু লিখছিলাম সবই যেন যেমন করে লেখা উচিৎ নয় তার উদাহরণ হয়ে উঠছিল। তার সামান্য পরে পুলিয়াতে পড়ানোর একটা ডাক পাই। পুলিয়া বিদ্যাপীঠের আচার্যভবনের প্রাচীরে বসে দেখতুম রাখাল ছেলেরা গ, মোষ, ছাগল, ভেড়া নিয়ে মাঠের প্রান্তে চলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে প্রাচীর থেকে নেমে, মাঠের দিকে হাঁটা দিতাম। দু-চারদিন যাতায়াতের পর ভাব হল, কথা হল, তঁ াদের বাঁশীর সুর শোনা গেল। তাদের ঘর - সংসারেও যাওয়া গেল। আবার লেখার ইচ্ছে হল। 'গোষ্ঠ' নামে একটা গল্প লিখলাম। 'পরিচয়' পত্রিকায় ৮০ সালের শারদ সংখ্যায় ছাপা হল। এই গল্পটার কথা বিশেষ করে বলছি কারণ এই গল্পটি থেকে প্রকরণগতভাবে কাহিনীর বাহির কাঠামো থেকে অন্তর কাঠামোয় আমার হামাগুড়ি দেওয়ার শু। গল্পটি এক রাখাল ছেলের। ছেলেটি মহাজনের ভেড়া চরায়। এক শীতের রাতের তার একটি ভেড়া দলছুট হয়। এক সময় সে ভেড়া

টিকে পায়। কিন্তু প্রাণীটি নড়তে পারে না প্রসব ব্যথায়। অবিরত ভেড়াটি চেঁচায় তার আলানে উদ্ধৃত দুধের চাপে। ঐ পেট - আকাল রাখাল ছেলেটি শীত - আক্রান্ত ঠোঁট দুটি ভেড়ার স্তনবৃন্তে ঠেকায়। দুধ টানে। উষ্ণ হয়। পরে ভেড়াটি দুটি শাবক প্রসব করে। তার ভেতর একটি মৃত। ছেলেটি সকালে যখন মহাজনের বাড়ি ফেরে তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেয় মহাজন।

এই গল্পের বাইরের কাঠামো। এর ভেতর আর একটি গল্প ঢুকে পড়েছে। তা হল ঐ রাখালটির ভেড়ার বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ টানা। এর ভেতর একজন মানুষ এবং একটি প্রাণীর আদান - প্রদানের জায়গাটি ধরতে চেয়েছিলাম। প্রায় তিনপাতা জুড়ে সে বিবরণ। ঐ তিনপাতার জন্য কাটা ধানের গোছের ওপর শুয়ে ভেড়ার বাঁটে মুখ রেখেছি। পুলিয়ার ঐ ক্ষেত, আকাড়া মাঘের শীত, বালি - পাথুরে জেলার নির্জলা তরল দুধের দৈহিক অনুভূতি ছাড়া গল্পের এই অংশটি লেখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।আলোচনা - সভার বাক্যরীতিতে যাকে বলা হয় 'দেশজ উপাদান' তা আমার কাছে পুলিয়ার ঐ জমি, ঐ শীত, ঐ ফাটলময় দুধের বাঁট।

অন্য একটি গল্পের কথায় আসি --- 'মৌজা ডোমপাটি'। এক বন্ধুর 'টু-হুইলারে' চেপে বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়েরে মেলা দেখতে যাচ্ছিলাম। পথে পড়ল 'মৌজা ডোমপাটি' নামে একটা জায়গা। অবাক হলাম -- ডোমেদের মতো এমন এক গরীব জাতের পদবীর সঙ্গে এই দিগন্ত - বিস্তৃত ক্ষেতের নাম জড়িয়ে গেল কেমন করে? মেলা থেকে ফিরে ঐ এলাকার পুরনো মানুষজনের সঙ্গে কথা হল। ঐ এলাকায় বিষ্ণুপুরের এক মল্লরাজার বংশধর রাজত্ব করতো। একবার রাজা তার রাজ - বাদককে ডেকে বলল তারশ্বাসের জোর কতখানি রাজা দেখবে। রাজার হাতি চলবে আর ফ্লুটের স্বর ধরে রাখবে রাজ - বাদক। ফ্লুটের এক স্বরে হাতি যতখানি যাবে, রাস্তার দু-পাশের ততখানি জমি রাজ - বাদকের।

বিষয় মিলেছে কিন্তু কোন উপাদান গল্পটি তৈরি করি? মেলা ফেরৎ কলকাতা না এসে আমার নিজের গাঁ - বাঁকুড়া জেলারজয়পুর থানার গেলিয়াতে গেলাম। আমাদের গাঁয়ে যে বাজনা দল তার মাস্টার হল মধুসূদন বিশ্বাস। সন্ধ্যের পর ডোমপাড়ায় হাজির হলাম। মধুসূদন বিশ্বাস আমাকে কোনো প্রশ্ন করার ফুরসৎ দিল না। বলে চলল সে কেমন করে ফ্লুট বাজিয়েছে আমার বাবারবিয়েতে, আমার নিশাদিদির বিয়েতে, আমার দাদার মুখেভাতে। যখন আমার বিয়েতে পৌঁছল তখন রাত ন'টা। আমি অনেক কষ্টেআমার পরিবার থেকে সংসারের কথাবার্তাগুলো ঘুরিয়ে দিলাম। মধুসূদন বলে চলল তার পরিবারের আনন্দ - সুখের কথা। পেটেরচিন্তায় তাকে ভিটে ছাড়তে হয়নি। তার টি. বি. হয়েছিল। কিন্তু বাবা মহাদেবের কৃপায় সে সেরে উঠেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে কত লোক মারা গেছে। কিন্তু তার সংসারে হাত পড়েনি। তার নাতি এনকেফেলাইটিসে মারা গেছে কিন্তু পরের বছরই আর একটি নাতিদিয়ে ভগবান পুরনো হিসেবে ফিরিয়ে দিয়েছেন। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল আমাদের গাঁয়ের মধুসূদন বিশ্বাস যেন আমাদের প্রতিমূর্তি। বাইরে ততক্ষণ ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। আমি মধুসূদনকে বললুম একটু ফ্লুট বাজিয়ে শোনাতে। সে দু-হাতে তুলে নিল তার আপন স্বর ঃ

নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়
সুরে বেদনা বাজে গো কোন্ হিয়া
কত সুখ আসে যেন আলোক ছায়া
নিশীথ রাতে জাগে তারারই সাথে...

যে মানুষটি তার মনের কথা শব্দ দিয়ে গড়তে পারেন কিংবা চায়নি সেই তার বুকখানি সুরের টানে হাট করে খুলে দিল। ছ'বিঘের ভাগচাষী মধুসূদনের কণ সুর তার সুখের কথাগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। মৌজা ডোমপাটি গল্পটি লিখতে গিয়ে কথা আর সুরের এই বিপরীত অবস্থানকে ধরতে চেয়েছিলাম। বুঝতে চেয়েছিলাম একটি ফ্লুটের বুকের ভেতর আমাদের দেশ, সময় সমাজ ও অর্থনীতির কত উপাদান ভরা থাকে।

'মানুষের ইতিহাস' নামে একটি গল্প লিখেছিলাম বছর কয়েক আগে। গল্পটিতে ইতিহাসের এই গবেষকের সঙ্গে এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর বেশ অনেকখানি কথোপকথন আছে। গবেষণার একটা নিজস্ব রীতি আছে, গবেষকদের প্রশ্নের এক আপন ধরতাই আছে। গবেষণার যে সব নিয়মকানুন আমরা অনুসরণ করি তার পুরোটাই বিদেশের, আরো নির্দিষ্টভাবে বললে পশ্চিমের। ৮-এর দশকের প্রথমে আমি হায়দ্রাবাদে গিয়েছিলাম সামান্য পড়াশোনার প্রয়োজনে। ওখানে গবেষণারীতি বিষয়ে বলতে গেলে একটা পুরো 'পেপার'ই ছিল। ফেল না করার অধ্যাবসায়ে দু-চারটে রাত ও-সব জিজ্ঞাসা আর ভ

ারতীয় দেশজ উত্তরের ভেতর কতখানি দূরত্ব থেকে যেতে পারে সেটাই বুঝতে চেয়েছিলাম ঐ গল্পে ---
পলাশ ঃ বিয়াল্লিশের কথা মনে আছে?
পঞ্চানন কর্মকার ঃ দেশে জল নাই, মাঠে ধান নাই। আকাল।
পলাশ ঃ সে তো তেতাল্লিশ।
পঞ্চানন ঃ অ।
পলাশ ঃ বিয়াল্লিশের আন্দোলন। স্বাধীনতা আন্দোলন, তার আগে বাঁকুড়া জেলার সশস্ত্র আন্দোলনের নানা পর্ব।
পঞ্চানন ঃ অ।
পলাশ ঃ ভব কর্মকারের দ্বীপান্তর হয়ে গেল।
পঞ্চানন ঃ ভবর বউটি লক্ষ্মী প্রতিমা।
ঐ গল্পেরই কিছু পরে --
পলাশ ঃ আপনি জেলে গেলেন কেন?
পঞ্চানন ঃ পুলিশ ধরে লিয়ে গেল।
আরো কিছু পরে --
পলাশ ঃ রবিবাবু তো সামান্য দিন জেলে ছিলেন। আপনার তো এক বছর। জেল কর্তৃপক্ষের বিদ্ধে--
পঞ্চানন ঃ নামে মুতে দিলুম।
পলাশ ঃ কার?
পঞ্চানন ঃ রতন মাডোর ডাকাতির আসামি। পাশাপাশি থাকতুম। সেদিন সকালে ডাব পেড়ে দেয়নি বলে রতনকে পেট াল সেপাইটা। রাতে লোহার দরজার গায়ে হেলান দিয়ে ঢুলছিল। মাথাটা হেলে গিয়ে নাকের ফুটো দুটো ওপরে। রতন আর আমি মুতে দিলুম। মিথ্যে কেসে একটা বাড়তি বছর জেলে।
পলাশ ঃ রবিবাবু...
পঞ্চানন ঃ রবির মতো মানুষ হয় না গো। আকালের বছর আমি তো জেলে। আমার সংসারে প্রতি হপ্তায় চাল, কুমড়ো, নুন, তেল -- সব পাঠিয়েছে।
...একই গল্পের সামান্য কিছু পরে ---
পলাশ ঃ জেলের কথা বলুন।
পঞ্চানন ঃ উঁচু উঁচু দেয়াল। টকটকে লাল। পুলিশ। হাতে বন্দুক।
পলাশ ঃ জেলের মানুষদের কথা বলুন।
পঞ্চানন ঃ রতন মাডোরের যেমন ছাতি তেমন অন্তর।
পলাশ ঃ জেলের কোন্ কথা আপনার এখনো মনে পড়ে?
পঞ্চানন ঃ ছাড়া পাবার আগে এক সাহেবের বাংলোতে বাগানের কাজ করতুম।
পলাশ ঃ কতদিন করেছিলেন?
পঞ্চানন ঃ মাস খানেক।
পলাশ ঃ তা কী হল?
পঞ্চানন ঃ একদিন দেখি -- হি হি -- কাঁচুলি আর ইজের পরে -- হি হি -- সাহেবের বউ -- হি হি --
পলাশ ঃ আপনার বন্ধুদের কী হল? তারা কোথায় গেল?
পঞ্চানন ঃ রবে কংগ্রেস, বিজন তেভাগা, রতন সাধু...
পলাশ ঃ আপনি জেল থেকে বেরিয়ে কী করলেন?
পঞ্চানন ঃ রাজুর মায়ের পেটে রাজু এল।

উপাদানের দেশ ও বিদেশ আমাদের একাধিক গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়। 'বারোমাস' পত্রিকার আমার 'পশ্চিম - পূর্ব' নামে

যে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে সেখানেও ভারতীয় লোক - জীবন এসেছে কাহিনীর বিষয় হিসেবে। কাহিনীটি লেখার আগে একটি বিষয় আমাকে ভাবিয়েছিল -- কডওয়েলের মতো সংস্কৃত প্রেমিক মানুষ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কেন 'চণ্ডীমঙ্গল' অনুবাদে হাত দিলেন। এটা কি নিছক বৈচিত্র্যের সন্ধানে নাকি এর ভেতর কডওয়েলের জীবনচর্যার কোনো বড় রকম বদল ঘটে গেল? সে-সন্ধানে ব্রিটিশ সামাজিক - সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রায় পঁচাত্তর বছর (১৮২৫ - ১৯৩০) উল্টে দেখলাম। পশ্চিমীদের প্রচলিত বাত - প্রেমের বিপরীত এক অভিজ্ঞতায় পৌঁছালাম কডওয়ের এবং তাঁর সময় ও সমাজপাঠের ভেতর দিয়ে। আমার দ্বিতীয় উপন্যাস 'মিছিলের পরে' -তেও সূর্য সাঁই আর তণ বিপ্লবীদের কথোপকথনে এই দেশি -বিদেশি দ্বন্দ্ব হয়ত আপনাদের চোখে পড়বে।

আমি আমার নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতার কথাই আপনাদের জানালাম। বর্তমানে কবিকঙ্কণ মুকুন্দের 'ধনপতি - খুল্লনা' উপন্যাসটি নিয়ে একটি আখ্যান লেখার ঘোরে আছি। গ্রাম অংশ বেরিয়েছে এবারের শারদ 'সংবাদ দর্পণে'। মুকুন্দের পদ্য এবং মুকুন্দের পদ্যনির্ভর আমার গদ্য জুড়তে জুড়তে এই লেখা। ব্রিটিশ রাজত্বের আগের এই কাব্যে যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য আমার দেশকে শেকল পরার আগে খোঁজা। উপন্যাসটি পুরোটা লেখা হলে কি দাঁড়াবে জানি না। কিন্তু আমি মৌজে আছি। কোনো সাহেব নেই, কোনো ইংরেজি নেই -- কোনো ব্রেজনেভপন্থী নেই, কোনো ইয়েলৎসিনবাদী পন্থা নেই, কোনো ঝিপ্রেমিক নেই, কোনো হিন্দুবাদী নেই -- মুকুন্দের সঙ্গে সঙ্গে বসে লহনা - খুল্লনা - ধনপতির সংসার দেখছি আর দু-জনে বসে লিখছি, সে এক দাণ মজার ব্যাপার। কেউ কেউ বলেছেন লেখাটিকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে উপস্থাপন হলে অন্য মাত্রা পেত। অতীতকে এ-ভাবে বিশ্লেষণ করার তো উদাহরণ আছেই -- শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী', মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্য' কিংবা শাঁওলী মিত্রের 'নাথবতী অনাথবৎ'। কিন্তু আমি নিজে সে - রকম সাহস পাইনি। আসলে আমার কিংবা আমাদের মনের ভেতর কতখানি আমাদের দেশ আর কতখানি বিদেশ দখল করে রেখেছে সে বিষয়ে কি আমি বা আমরা নিজেরাই সচেতন। আমাদের লালিত আধুনিকতার কতখানি দেশি আর কতখানি বিলিতি সে কথা কি ছাই আমরা নিজেরাই জানি!

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com